শিশুতোষ সিরিজের ২য় বর্ষের নবম সংখ্যা

রামকৃষ্ণের দেদার গল্প

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৯।

শিশির পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

মূল্য ।৵৹ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—আবদুল গফুর,
নিউ ব্রিটেনিয়া প্রেস,
২৪২-১ নং অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।

সূচীপত্র।

রামকৃষ্ণের দেদার-গল্প

পাগ্‌লা হাতী

এক বনে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বনের ভিতর তাঁহার আশ্রম। সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম—কাজেই বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাধুর শিষ্যও অনেকগুলি। সশিষ্য সাধু সেই বনের ভিতর বাস করেন, আর দিনরাত ভগবান আরাধনায় দিন কাটান। অবসর সময়ে সাধু তাঁহার শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করেন। একদিন সকালে আশ্রমের সম্মুখে শিষ্যরা সাধুকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, সাধু তাহাদের ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছেন। নানা উপদেশের পর তিনি বলিলেন,—"শুধু তোমরা এইটুকু ভাল করিয়া মনে রাখিও—যে সকল জীবের ভিতরই নারায়ণ আছেন—এবং এইটুকু জানিয়া সকল জীব-

কেই নমস্কার করিবে। ভগবান সকল জীবের ভিতরই আছেন—কাজেই সকল জীবই নারায়ণ।”

ইহার কিছুদিন পরে হোমের জন্য সাধুর কিছু কাঠের প্রয়োজন হইল। তিনি তাঁহার একটী শিষ্যকে কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য বনে পাঠাইলেন। গুরুর আদেশ পাইয়া শিষ্য কাঠ আনিতে কুঠার লইয়া বনে প্রবেশ করিল। সে আপন মনে শুখ্না কাঠ খুঁজিতে খুঁজিতে বনের ভিতর অগ্রসর হইতেছিল সেই সময় হঠাৎ তাহার পিছন হইতে রব উঠিল,—“পালাও—পালাও। পাগ্‌লা হাতী ছুটেছে—পাগ্‌লা হাতী ছুটেছে।”

পাগ্‌লা হাতী ছুটিয়াছে শুনিয়া সকলে যে যেখানে পারিল—পলাইয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু সেই সাধুর শিষ্যটী পালাইল না; সে যেমন অগ্রসর হইতে-ছিল তেমনিই অগ্রসর হইতে লাগিল। পিছন হইতে সকলেই চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—“পালাও—পালাও—এখনি হাতীর পায়ের তলায় যাইবে।”

কিন্তু সেই শিষ্যটী সে কথা ভ্রূক্ষেপও করিল না
—সে মনে মনে ভাবিল,—"গুরু বলিয়াছেন সব জীবই নারায়ণ—তবে আমি পালাইব কেন ?"

দেখিতে দেখিতে সেই পাগ্‌লা হাতী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাহুত হাতীর উপর হইতে চাৎকার করিয়া বলিল,—"পালাও— পালাও।"

শিষ্য তবুও নড়িল না,—সে নমস্কার করিয়া স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। কিন্তু পাগ্‌লা হাতী তাহার স্তব স্তুতি শুনিবে কেন—সে তাহাকে শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—সেইরূপেই উন্মত্ত ভাবে ছুটিয়া চলিয়া গেল। হাতীর শুঁড় হইতে সজোরে মাটিতে পড়িয়া শিষ্য জ্ঞান হারাইল। শিষ্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে—এ সংবাদ সাধুর আশ্রমে পৌঁছিবামাত্র কয়েকজন শিষ্য যাইয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসিল। তাহার পর তাহারা ক্ষতস্থানে ঔষধ বাঁধিয়া দিল। কিছুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর সেই শিষ্যের

চৈতন্য হইল,—তখন সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"পাগলা হাতী আসিতেছে শুনিয়া কেন তুমি পালাইয়া গেলে না?"

তখন সেই শিষ্যটী উত্তর দিল,—"গুরুদেব যে বলিয়া দিয়াছেন,—সকল জীবেই নারায়ণ আছেন। তাই আমি নারায়ণ আসিতেছেন শুনিয়া পালাই নাই।"

শিষ্যের কথায় সেই সাধু হাসিয়া বলিলেন,—"বাবা, হাতী নারায়ণ আসিতেছিলেন সত্য কিন্তু মাহুত নারায়ণও তো তোমায় পালাইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। তাঁর কথা শুনিলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথা শোনাও তো তোমার উচিত ছিল।"

শিষ্য এ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না—চুপ করিয়া রহিল। সকল জীবের ভিতরই নারায়ণ আছেন সত্য কিন্তু তা বলিয়া সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা চলে না। শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ—কিন্তু সব জল কি খাওয়া চলে? কোন জলে ঠাকুর সেবা হয় আবার কোন জলে কেবল বাসন

মাজা চলে। সেইরূপ সকল জীবের ভিতর নারায়ণ আছেন সত্য কিন্তু তা বলিয়া হাতী নারায়ণ শুধু ভাবিলে চলিবে না, মাহুত নারায়ণের কথা শোনাও উচিত।

রাম নাম

বিভীষণের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই। রাবণ রাক্ষস---তার দশ মাথা কুড়ি হাত। সে ছিল লঙ্কার রাজা। সেই রাবণের ভাই বিভীষণ বড় রাম ভক্ত ছিলেন। এক দিন তাঁর কাছে একটী লোক আসিয়া বলিল,—"আমাকে সমুদ্রের ওপারে একবার যাইতে হইবে। আপনি তো শুনি রাম ভক্ত—আপনি আমার উপায় করিয়া দিন।"

বিভীষণ বলিলেন,—"তোমার সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি এখনি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া বিভীষণ একটী পাতায় তিনবার রাম নাম লিখিয়া সেই পাতাটী সেই লোকটীর কাপড়ের একটা খুঁটে বাধিয়া দিয়া বলিলেন,—"যাও এইবার তুমি অনায়াসেই জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া

যাইতে পারিবে। কিন্তু সাবধান আমি তোমার কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধিয়া দিলাম তাহা কিছুতেই খুলিয়া দেখিও না।”

সেই লোকটী সমুদ্রের পারে যাইবার জন্য সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, ও অনায়াসেই সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপারে সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। তাহার ভারি ইচ্ছা হইল একবার কাপড়ের খোঁটটা খুলিয়া দেখে বিভীষণ তাহার কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধিয়া দিয়াছে। কিন্তু বিভীষণ তাহাকে দেখিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন—সে কথাও তাহার মনে পড়িল। কাজেই সে তাহার সে ইচ্ছাটাকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার সেই ইচ্ছাটা প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে আর কিছুতেই সামলাইতে পারিল না—আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই পরপারে পৌঁছিতে পারা যায়—সেই সময় সে তাহার কাপড়ের খোঁট খুলিয়া

বিভীষণ যে পাতাটা বাঁধিয়া দিয়া ছিলেন তাহা বাহির করিয়া দেখিল। দেখিল, পাতাটায় কিছুই নাই কেবল রাম নাম লেখা। লোকটীর এই দেখিয়া কেমন যেন একটু অবিশ্বাস হইল,—মনে মনে বলিল,—"আরে রামঃ। এটা তো কিছুই নহে। বিভীষণ আমার সহিত আচ্ছা চালাকী করিয়াছে।" যেমন তাহার এই কথাটী মনে পড়িল—অমনি সে টুপ করিয়া সমুদ্রের ভিতর ডুবিয়া গেল। বিশ্বাসই পৃথিবীতে সব। যাহার বিশ্বাস আছে সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। লোকটা বিশ্বাসের বলে সমুদ্রের উপর দিয়াও হাঁটিয়া যাইতে পারিয়াছিল। সে যদি বিশ্বাস না হারাইত তাহা হইলে অনায়াসেই পরপারে পৌঁছিতে পারিত। বিশ্বাসই পৃথিবীতে সব—বিশ্বাস করিতে পারিলে ভগবান লাভও অনায়াসে হইয়া থাকে।

হোমা পাখী

বেদে এক রকম পাখার কথা পাওয়া যায়। তাহাকে হোমা পাখী বলে। খুব উঁচু আকাশে এই হোমা পাখী বিচরণ করে। এই পাখী সেই উঁচু আকাশেই ডিম পাড়ে। তারা ডিম পাড়িলেই সেই ডিম আকাশ হইতে মাটীতে পড়িতে থাকে। কিন্তু তাহারা এত উঁচু আকাশে ডিম পাড়ে যে সেই ডিম পড়িতে পড়িতেই ফুটিয়া যায় ও ডিম হইতে বাচ্ছা বাহির হয়। ডিম ফুটিয়া বাচ্ছাও যেমনি বাহির হয়—সেও অমনি মাটীর দিকে পড়িতে থাকে — পড়িতে পড়িতেই তাহার চোখ ফুটে ও ডানা গজাইয়া উঠে। যেমনি সেই বাচ্ছাটার চোখ ফুটিয়া উঠে অমনি সে দেখিতে পায় যে, সে মাটীর দিকে পড়িতেছে—মাটীতে পড়িলে এখনি তাহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তখন সে

আর কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না --অমনি ডানা নাড়িয়া উপর দিকে উঠিতে আরম্ভ করে --এবং কেবলই উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে একেবারে মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হয় !

মানুষও ঠিক তেমনি জন্মাইবার পর মায়ার ভেতর দিয়া কেবলই নিচের দিকে পড়িতে থাকে। কিন্তু এই ভাবে পড়িতে পড়িতে তাহাদেরও জ্ঞানের সঞ্চার হয়—মায়া কাটিয়া যায়—তখন তাহারা আবার ভগবান লাভ করিবার জন্য উপর দিকে ছুটিতে থাকে এবং ছুটিতে ছুটিতে একদিন ভগবান লাভ করে।

কৃষ্ণ কিশোর

কৃষ্ণ কিশোর পরম ধার্ম্মিক—অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেব দ্বিজে তাঁহার অসীম ভক্তি। অতি সদাচারে দিন যাপন করেন—কাহারও ছোঁওয়া নেওয়া আহার করেন না। গ্রামের লোক কৃষ্ণ-কিশোরের আচার ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহাকে যথেষ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা করে—সকলেই বলে কৃষ্ণ কিশোরের মত এমন সদ্ ব্রাহ্মণ আর আজ কালকার দিনে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণ কিশোরের একবার তীর্থ ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি শেষ বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন ধাম। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে—বৃন্দাবনের ধূলি অঙ্গে মাখিলে ভক্তের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভগবানের লীলার কথা যতই মনে হইতে লাগিল—ততই কৃষ্ণ কিশোরের

প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনের যাহা কিছু দেখিবার জিনিষ সকলই দেখিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণ কিশোর ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূরে গিয়া পাড়লেন। তিনি ভগবানের ভাবে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার বেলার দিকে খেয়ালও ছিল না। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল তখন দেখিলেন মাথার উপর সূর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—রৌদ্রের তাপে চারিদিক পুড়িয়া যাইতেছে। তিনি বেলার দিকে চাহিয়া সত্বর গৃহে ফিরিবার জন্য দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই ভাবে কিছুদূর চলিতেই রৌদ্রের তাপে তাঁহার অতিশয় জল পিপাসা পাইল। তিনি একটু জল পান করিবার জন্য নিকটেই একটী কূয়ায় নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কূয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী লোক কূয়া হইতে জল তুলিতেছে। তিনি তাহাকে বলিলেন,—"ওরে ভাই—আমাকে এক ঘটী জল দে দিখি। আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে।"



মুচি তিনবার শিব নাম উচ্চারণ করিয়া এক ঘটি জল তুলিয়া·

যে লোকটী জল তুলিতেছিল সে কৃষ্ণ কিশোরের গলার পৈতা দেখিয়া বলিল,—"ঠাকুর মহাশয়,আমি আপনাকে কেমন করিয়া জল দিব—আমি যে জাতে মুচী।"

কৃষ্ণ কিশোর বলিলেন,—তার জন্যে আর ভাবিবার কি আছে? তুই এক কাজ কর—তিনবার শিব নাম উচ্চারণ কর—তাহা হইলেই তোর দেহ শুদ্ধ হইবে—তারপর তুই আমায় জল তুলে দে।"

মুচী তিনবার শিব নাম উচ্চারণ করিয়া এক ঘটী জল তুলিয়া কৃষ্ণ কিশোরকে প্রদান করিল।

কৃষ্ণকিশোর মহা তৃপ্তির সহিত সেই জল পান করিলেন। ঈশ্বরের নাম করিলে দেহ মন শুদ্ধ হইয়া যায়—এ বিশ্বাস যাহার আছে সেই যথার্থ ভক্ত। এমন বিশ্বাস না থাকিলে কি আর ভগবান লাভ করা যায়? তোমাদের যাহাতে ভগবানের উপর এইরূপ বিশ্বাস হয়—বাল্যকাল হইতে তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

হালদার পুকুর

এক দেশে একটী পুকুর ছিল—লোকে সেটাকে হালদার পুকুর বলিত। সেই পুকুরটার পাড়ে সকলে বাহ্যে করিয়া আসিত। যাহার পুকুর তিনি প্রত্যহই সকলকে গালিগালাজ করিতেন—যাহাতে কেহ তাঁহার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে না করে তাহার জন্য তিনি নানাভাবে সকলকে বারণ করিতেন। কিন্তু তাহার কোন কথায় কেহ ভ্রূক্ষেপই করিত না। যেমন প্রত্যহ প্রত্যূষে সকলে হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করিয়া যাইত তাঁহার শত নিষেধ সত্ত্বেও তাহারা ঠিক তেমনিই বাহ্যে করিয়া যাইতে লাগিল। যাহার পুকুর তিনি এই ব্যাপারে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া শেষ সরকারকে এই বিষয় একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য দরখাস্ত প্রদান করিলেন। দরখাস্তের ফলে

সরকার হইতে একজন চাপরাশী আসিল এবং সে সেই পুকুরের পাড়ে একটী কাগজ মারিয়া দিয়া গেল —তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—এইখানে বাহ্যে করিও না। সরকার হইতে এই কাগজ মারিয়া দিবার পর আর কেহ হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করিতে আসিল না। একদিনেই সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল।

ভগবানের বিভূতি লাভ যে করিতে পারে নাই—তাহার উপদেশের কোন মূল্য নাই। সে ভগবানের কথা বলিলে লোকে হাসিঠাট্টা করিয়া থাকে। উপদেশ দিতে হইলে চাপরাশের প্রয়োজন। যাহার চাপরাশ আছে—তাহার কথা লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। অপরের দুই শত কথায় যে কাজ না হয় তাহার এক কথায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়া থাকে। কাজেই অপরকে উপদেশ না দিয়া যাহাতে ভগবান লাভ করিতে পারা যায় মানুষের তাহারই চেষ্টা করিতে হয়।

নিকষা বুড়ি

তোমরা রাম রাবনের যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ। রাবন রাক্ষস—লঙ্কার রাজা—ভয়ঙ্কর বীর। সে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে বন্ধন করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিবার জন্য লঙ্কায় এসে উপস্থিত হন। তারপর রাম রাবনে ভয়ানক যুদ্ধ হয়—যুদ্ধে রাবন সবংশে নিধন হয়। রাবন বধ করিবার পর শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসপুরীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে পুরীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া,—রাবনের মা বুড়ি নিকষা ছুটিয়া পালাইয়া গেল। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত লক্ষণও রাক্ষস পুরীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন,—তিনি নিকষা বুড়িকে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতে দেখিয়া বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি তাড়াতাড় শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা,—একি ব্যাপার বলুন দেখি? এই রাবনের মা নিকষা

—এত বুড়ী—এত পুত্রশোক পাইয়াছে—তবুও ইহার এত প্রাণের মায়া! আপনাকে দেখিয়া পালাইয়া যাইতেছে?”

লক্ষণের কথায় শ্রীরামচন্দ্র নিকষাকে নানাভাবে অভয় দিয়া নিজের নিকটে ডাকিয়া আনিলেন ও অতি মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি রাবণের মা—বয়েস তোমার যথেষ্টই হইয়াছে—এখনও তোমার প্রাণের এত মায়া?”

শ্রীরামচন্দ্রের কথার উত্তরে নিকষা বুড়ি ভক্তি গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিল,—“রাম,—এতদিন বাঁচিয়া আছি বলিয়াই না তোমার এত লীলা দেখিলাম। তাই আরও বাঁচিবার সাধ হয়—বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে তোমার আরও কত লীলা দেখিতে পাইব।”

যাহারা নিকষা বুড়ির মত মনে করে—ভগবানের লীলা দেখিব বলিয়াই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছি—তাহাদেরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা সার্থক। এইরূপ বিশ্বাস যাহাদের প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহারাই যথার্থ মানুষ।

চোখের জল

ভীষ্মদেব দশদিন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া শর-শয্যায় পড়িয়াছিলেন। তাঁর ইচ্ছা মৃত্যু তাই অকালে মরিবেন না বলিয়া বহুদিন শর-শয্যায় ছিলেন। তাহার পর যখন অকাল চলিয়া গেল তখন তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবামাত্র কুরু পাণ্ডব সকলেই আসিয়া তাঁহার শর-শয্যার চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদিগের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যাঁহারা ভীষ্মদেবকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই দেখিলেন,—ভীষ্মদেবের দুই চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। অর্জ্জুনের এই ব্যাপার দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল—তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—সখা, একি আশ্চর্য্য! পিতামহ যিনি স্বয়ং ভীষ্মদেব—সত্যবাদী—জিতেন্দ্রিয়—

অষ্টবসুর অন্যতম বসু—দেহত্যাগের সময় মায়ায় তাঁহারও চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। এর অধিক আর আশ্চর্য্যের জিনিষ কি থাকিতে পারে?”

অর্জ্জুনের কথায় শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি স্বয়ং ভীষ্মদেব। কিন্তু মৃত্যু-কালে, আশ্চর্য্য, মায়ায় আপনারও চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতেছে?”

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া ভীষ্মদেব মুখ তুলিয়া একবার ভগবানের মুখের দিকে চাহিলেন,—গাঢ়স্বরে বলিলেন,—“কৃষ্ণ কিসের জন্য আমার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে সে কথা তুমি ত ভাল রকমই জান! যখনই ভাবিতেছি স্বয়ং ভগবান পাণ্ডবদের রথের সারথী কিন্তু তবুও তাহাদের দুঃখ বিষাদের সীমা পরিসীমা নাই তখনই মনে হইতেছে ভগবানের কার্য্যের আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই কথা যতই আমার স্মরণ হইতেছে ততই আমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

ভগবান অনন্ত; তাঁহার শক্তিও অনন্ত।

কাজেই তাঁহার কার্য্যের মানুষ কোনই অন্ত পায় না। তিনি কেন ও কি জন্য কোন্ কার্য্য করিতেছেন—তাহা বুঝিতে পারা মানুষের সাধ্য কি? কাজেই তাঁহার কার্য্য কারণের বিচার না করিয়া কায়-মন-প্রাণে তাঁহার চরণে নিজেকে অর্পণ করাই প্রত্যেক মানুষের উচিত।

শব সাধন

একজন মহা তান্ত্রিক লোক ছিল। সে শব সাধন করিবে বলিয়া সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া এক নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেইখানে স্থানে একটা স্থান একটু পরিস্কার করিয়া লইয়া একটা পচা মড়ার আসনে বসিয়া ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করিল। কিন্তু সে ভগবতীর সাক্ষাৎ পাইল না—চারিদিকে কেবল বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। শেষ সে ভয়ে দিশেহারা হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল—সেই সময় একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া গভীর বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই তান্ত্রিক যেখানে মড়ার আসন করিয়াছিল—তাহার সম্মুখেই একটা গাছে একটী লোক বাঘের ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়া বসিয়াছিল। সে সেই বৃক্ষের উপর হইতে অবাক হইয়া সেই তান্ত্রিকের পূজা দেখিতেছিল। সে

যখন দেখিল সেই তান্ত্রিককে বাঘে লইয়া গেল, তখন আর সে কিছুতেই বৃক্ষের উপর থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে নামিয়া পড়িল ও সেই মড়ার উপর বসিয়া পড়িল। সরঞ্জাম সমস্তই চারিদিকে সাজান ছিল—সে সেই পূজাপর্ব্বণ দিয়া ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করিয়া দিল। অতি অল্পক্ষণ সেই মড়ার উপর বসিয়া মায়ের নাম জপ করিতেই মা ভগবতী আসিয়া সম্মুনে দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, —"বৎস! আমি তোমার পূজায় প্রসন্ন হইয়াছি—মনোমত বর গ্রহণ কর।"

স্বয়ং ভগবতীকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সেই লোকটার আনন্দে একেবারে গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হইয়া উঠিল,—সে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি গদ্ গদ্ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা—তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। একটা কথা মা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। মা এই তান্ত্রিক এত খাটিয়া এত আয়োজন করিয়া এতদিন ধরিয়া তোমার আরাধনা

করিতেছিল—কিন্তু মা তার প্রতি তোমার দয়া হইল না কেন? আর আমি কোনদিন তোমার পূজা করি নাই—আমার ভক্তিও নাই—গুণও নাই—আমার প্রতি তোমার কিসে এত করুণা হইল?”

মা ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“বৎস! পূর্ব্ব জন্মের কথা তোমার স্মরণ নাই। তুমি জন্ম জন্ম আমার সাধনা করিয়া আসিয়াছ সেই কারণ তোমার এই সকল জোট পাট হইয়াছে —এবং আমার দর্শন পাইলে। এখন বল কি বর চাও?”

সেই লোকটা তখন মনোমত বর চাহিয়া লইল। মা ভগবতী তাহাকে বর দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। পূর্ব্ব জন্ম যে আছে এই জন্যই আমাদের মানিতে হয়। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়া মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্ব জন্মে যে সৎপথে থাকিয়া ভগবানের ধ্যান ধারণা করিয়া আসে—পরজন্মে অতি অল্প আয়াসেই সে ভগবান লাভ করিতে পারে।

———

অবধূতের গুরু

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে এক অবধুতের চব্বিশটা গুরু ছিল। এই চব্বিশটী গুরুর ভিতর চিল আর মৌমাছিও তাহার গুরু ছিল। একবার তিনি এক জায়গা দিয়া আসিতেছিলেন সেই সময় দেখিলেন, —একটী পুকুরে জেলেরা মাছ ধরিতেছে। জেলেরা জাল হইতে মাছ বাহির করিয়া ডাঙ্গায় ফেলিয়া দিতেছিল। সেই সময় একটী চিল ছোঁ মারিয়া একটী মাছ লইয়া গেল। কিন্তু যেমনি চিল মাছ লইয়া আকাশে উড়িল অমনি মাছ দেখিয়া প্রায় এক শত কাক কা কা করিয়া তাহার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া চলিল। মাছ লইয়া চিল যেদিকে যায়— কাকগুলাও কা কা করিয়া সেই দিকেই ছুটে। এই ব্যাপারে চিল একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সে একবার উত্তর দিকে, একবার দক্ষিণ দিকে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। এইরূপ ছুটাছুটি করিতে

করিতে মাছটা তাহার নিকট হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। চিলের নিকট হইতে মাছটাকে পড়িতে দেখিয়া কাকগুলা এতক্ষণে চিলকে ছাড়িয়া সেই মাছটার আবার পিছনে ছুটিল। ছুটাছুটি করিয়া চিলটা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে এত-ক্ষণে একটা গাছের উপর আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল। অবধূত এই চিলের নিকট হইতে এই শিক্ষা করিলেন,—যে বাসনা থাকিতে মানুষ কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। চিলটার নিকট যতক্ষণ ওই বাসনারূপ মাছটা ছিল ততক্ষণই তাহাকে ছুটা-ছুটি করিতে হইতেছিল। মাছটা ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শান্তি আসিল, সে নিশ্চিন্ত হইল।

এইরূপ মৌমাছিও অবধূতের একটা গুরু ছিল। মৌমাছিরা বহু কষ্টে বহু পরিশ্রম করিয়া চাক বাঁধে ও মধু সঞ্চয় করে—কিন্তু তাহা অপরে আসিয়া ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। অবধূত মৌমাছির নিকট এই শিখিলেন,—সঞ্চয় করা ভাল নয়।

সঞ্চয় করিলে ভগবানের উপর মানুষের সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিতে পারে না। সেই জন্যই সাধুদিগের সঞ্চয় করা একেবারেই উচিত নহে। ভগবানের উপর যাহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে তাহার আর ভাবনা চিন্তা করিবার কিছুই থাকে না।

গোবিন্দজীর পূজারী

জয়পুরের গোবিন্দজীর পুরোহিতরা পূর্ব্বে বিবাহ করিতেন না। তখন তাঁহাদের সম্মানও খুব ছিল। একবার বিশেষ কোন একটা কাজের জন্য জয়পুরের মহারাজা গোবিন্দজীর পূজারীকে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লোক দিয়া ডাকিয়া পাঠান। রাজার লোক গিয়া মহারাজের আদেশ যখন পূজারীকে জানাইল তখন পূজারী বলিলেন,—"আমার রাজ দরবারে যাইবার অবসর নাই,—রাজার যদি দরকার হয় তাহা হইলে তিনি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।"

রাজার লোক গিয়া সেই কথায় রাজাকে বলিল। গোবিন্দজীর পূজারী তাঁহার বাসনা কামনা যাহা কিছু সমস্তই গোবিন্দজীর পায়ে অর্পণ করিয়াছিলেন। কাজেই তাহার তো কোন কামনা নাই, তিনি

রাজাকে ভয় করিবেন কেন! রাজার কাজ—কাজেই রাজাকে আসিতে হইল। তাঁহার পর রাজা মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া গোবিন্দজীর পূজারীর বিবাহ দিয়া দিলেন। বিবাহ হইবার পর আর পূজারীর সে দম্ভ রহিল না। বিবাহ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শত কামনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর রাজাকে ডাকিতেও হইল না। তখন তিনি প্রতিদিনই রাজ দরবারে যাইতে আরম্ভ করিলেন। না যাইয়া উপায় কি! পুত্রের অন্নপ্রাশন দিতে হইবে—পুত্রের পৈতা দিতে হইবে, পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে—প্রতিদিনই পয়সার প্রয়োজন।

ভগবানের যাঁহারা পূজারী তাঁহাদের বিবাহ করা উচিত নয়। বিবাহ করিলে শত কামনা আসিয়া মানুষকে জড়াইয়া ধরে—মানুষ স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলে। কাজেই তাঁহারা যে সম্মান লাভের উপযুক্ত সেই সম্মানটুকু তাহারা নিজেরাই হারাইয়া ফেলেন।

গোবিন্দজীর মালা

জয়পুরে এক সময় নিয়ম ছিল—আরতির সময় গোবিন্দজীর গলায় যে মালা পরাইয়া দেওয়া হইত সেই মালা পরদিন প্রত্যুষে রাজবাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। মহারাজা সেই মালা পরিয়া দরবারে বসিতেন। একদিন আরতির পর গোবিন্দজীর পূজারীর ইচ্ছা হইল, গোবিন্দজীর মালাটী একবার গলায় পরেন। বৃদ্ধ পুরোহিত মালাটী পরিয়া সারারাত্রি কাটাইলেন। সকালে যখন তাঁহার মনে পড়িল,—মালা লইতে এইবার রাজবাটী হইতে লোক আসিবে তখন তিনি তাড়াতাড়ি মালাটী গলা হইতে খুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। নিয়ম মত রাজবাড়ীর লোক আসিয়া মালাটী লইয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই রাজবাড়ী হইতে লোক আসিয়া পূজারীকে বলিল,—"মহারাজ আপনাকে এখনি একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন।"

সহসা এমন সময় মহারাজের এরূপ জরুরী

ডাক পড়িবার কারণ কি পূজারী ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজারী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পূজারি, গোবিন্দজীর মালা কাল রাত্রে কে পরিয়াছিল !"

পূজারীর বুক কাঁপিয়া উঠিল,--"সে একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। মহারাজা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে মালা কেহ পরিয়াছে ! তিনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"মহারাজা ও মালা আবার কে পরিবে ! সারারাত্রিই তো মালা গোবিন্দজীর গলায় ছিল।"

মহারাজা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তবে এই মালায় সাদা চুল কোথা হইতে আসিল ?

পূজারী ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিলেন,—"মহারাজা ও চুল গোবিন্দজীরই চুল। গোবিন্দজী অনেক দিনের—কাজেই তাঁহার কালো চুল সাদা হইতে আরম্ভ করিয়াছে।"

পূজারীর এই কথায় মহারাজা একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। ঠাকুরের কাল চুল সাদা হইতে আরম্ভ হইয়াছে—পূজারী কি বলিতেছে? তাহাও কি সম্ভব? তিনি পূজারীকে বলিলেন,—তোমার এ কথা সত্য কি মিথ্যা আমি দেখিতে চাহি। কাল সকালে আমি স্বয়ং গোবিন্দজীর মন্দিরে যাইব।"

পূজারী গোবিন্দজীর নাম স্মরণ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আহার করিতে পারিলেন না—এই বিপদ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার হইবেন সেই চিন্তাতেই সারাদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর তিনি নিয়মিত যেমন গোবিন্দজীর আরতি করিতে মন্দিরে গমন করেন সেই দিনও তেমনই গমন করিলেন। কিন্তু আরতি করিতে পারিলেন না। গোবিন্দজীর মুখের দিকে চাহিবা মাত্র তাঁহার নয়ন ফাটিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া কেবলই জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর। আজ চল্লিশ বৎসর

তোমার পূজা করিয়া আসিতেছি। যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা—কর।”

পূজারীর চোখের জল আর কিছুতেই রোধ হয় না। সে চোখের জলের ভিতর দিয়া কোন ক্রমে গোবিন্দজীর আরতি শেষ করিল। কাল প্রত্যুষেই মহারাজা গোবিন্দজীর মাথার চুল দেখিতে আসিবেন। পূজারী একবার গোবিন্দজীর মাথার দিকে চাহিলেন। গোবিন্দজীর মাথার চুলগুলি কালো মিস্‌মিস্ করিতেছে। পূজারীর বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল—তিনি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইলেন না। সে রাত্রে তাঁহার আর বাড়ী ফেরা হইল না,—মন্দির হইতে তাঁহার পদদ্বয় আর এক পাও অগ্রসর হইতে চাহে না। তিনি গোবিন্দজীর পায়ের তলায় পড়িয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। সারা রাত্রি চোখের জলের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে—তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ রাত্রে বোধ হয় তাহার একটু

তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা মন্দিরের দ্বার ঠেলাঠেলির শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলেন, ভোর হইয়াছে—দিনের আলো মন্দিরের ভিতরে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। তিনি ভীত কম্পিত হৃদয়ে মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। মন্দিরের সম্মুখে মহারাজা সপারিষদ উপস্থিত। পূজারি মন্দিরের দ্বার খুলিবামাত্র তিনি বলিলেন, "পূজারি, আমি গোবিন্দজীর চুল দেখিতে আসিয়াছি। দেখি কেমন গোবিন্দজীর চুল পাকিয়া সাদা হইয়াছে।"

পূজারী কোন উত্তর দিতে পারিল না, সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া মহারাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাজা আর কোন কথা না বলিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন,—তাঁহার পিছনে পিছনে পারিষদ-গণও মন্দিরের ভিতর প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু ঠাকুরের সম্মুখে গিয়া সকলে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একি! সত্যই তো গোবিন্দজীর মাথার সমস্ত চুল সাদা ধব্‌ধব করিতেছে, একগাছিও কাঁচা বা কালো নাই। মহারাজা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গোবিন্দজী,

প্রণাম করিলেন। তিনি এতদিনে বুঝিলেন, সত্যই তাঁহার ঠাকুর জীবন্ত। পূজারীও ঠাকুরের মাথার দিকে অবাক হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। একি! কাল যে ঠাকুরের মাথার চুল কালো কুচকুচে দেখিয়াছি। একরাত্রে কেমন করিয়া এমন সাদা হইল। তাঁহার প্রতি ঠাকুরের একি করুণা! মহারাজা পূজারীর পদধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন,—"পূজারি আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। আমি মানুষ আমার বিশ্বাসও মানুষের মতন। তোমাকে অবিশ্বাস করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা কর।"

মহারাজ সপারিষদ মন্দির হইতে বিদায় হইয়া গেলেন। আর পূজারী আবেগে আনন্দে নয়ন-জলে গোবিন্দজীর পদদ্বয় ধুইয়া দিতে লাগিলেন। ভগবান লাভের একমাত্র উপায় আকুলতা। তেমন আকুল হইয়া ভগবানকে ডাকিলে না আসিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। পূজারী আকুল হইয়া কাঁদিয়াছিলেন—সে আকুলতায় কি ভগবান স্থির থাকিতে পারেন!

যাহা মানুষে কখন ভাবিতে পারে নাই—পূজরীর আকুলতায় তাহাই সম্ভব হইল। গোবিন্দজীর কালো চুল সাদা হইয়া গেল।

হনুমানের ঘর

একজন লোকের পাহাড়ের উপর একখানা ঘর ছিল। অনেক পরিশ্রম করিয়া সেই লোকটী এই ঘরখানি প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই লোকটীর এই ঘরখানি ছিল বড় প্রিয়। সে মহা আনন্দে এই ঘরখানিতে বাস করিত। এই ভাবে কিছুদিন যাই-বার পর একদিন হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল। সেই লোকটীর পাহাড়ের উপরের কুঁড়ে ঘরখানি ঝড়ে মড় মড় করিতে লাগিল। কেমন করিয়া ঘরখানি রক্ষা হয় সেই লোকটী সেই চিন্তায় বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন হঠাৎ সেই লোকটার মনে পড়িল যে হনুমানের পিতা হইতেছেন পবন দেব। পুত্রের উপর পিতার স্নেহ না থাকিয়া যাইতে পারে না। হনুমানের ঘর বলিলে নিশ্চয়ই পবন দেব এ ঘরখানি রক্ষা করিবেন। তাই সে ঘর হইতে একটু মুখ বাহির করিয়া ঝড়কে সম্বোধন করিয়া কেবলই

বলিতে লাগিল,—"বাবা পবনদেব, ঘরখানি ভাঙ্গিও না—ঘরখানি ভাঙ্গিও না—এ ঘরখানি তোমারই পুত্র হনুমানের।"

কিন্তু তবুও ঘর মড় মড় করিতে লাগিল। লোকটা ভাবিল—রামের ঘর বলিলে হয়তো ঘর-খানা বাঁচিয়া যাইতে পারে। পবনের পুত্র হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে চিরদিন মানিয়া আসিয়াছে আর পবন মানিবে না? সে আবার বলিতে লাগিল,—"হে পবনদেব ঘরখানি ভেঙ্গ না—ঘরখানি ভেঙ্গ না—এ ঘরখানি শ্রীরামচন্দ্রের।"

কিন্তু লোকটার সে কথাতেও কিছু হইল না। ঝড় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। মড মড় করিয়া ঘর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তখন লোকটা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর খানিও ঝড়ে মড় মড় করিয়া ভূমিসাৎ হইল। তখন লোকটা—যা শালার ঘর—বলিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল।

যতক্ষণ ঘরখানি দাঁড়াইয়া থাকে ততক্ষণ মানু-

ষের তাহার উপর মায়া; ততক্ষণ সেইখানি রক্ষা করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে। কিন্তু একবার ভাঙ্গিয়া গেলে আর মায়া থাকে না। সংসারও ঠিক তেমনি—যতক্ষণ মানুষ তাহার ভিতর থাকে—ততক্ষণ মানুষ কেবল আমার আমার করিয়া উন্মত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইলে আর তাহার ভাবনা চিন্তা থাকে না।

কাক্ ভুষণ্ডী

কাক্ ভূষণ্ডীর বড় অহঙ্কার হইয়াছিল। সে কাহাকেও মানিত না। শ্রীরামচন্দ্র অবতার—অবাতার বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মানিল—কিন্তু ভূষণ্ডী কাক্ কিছুতেই স্বীকার করিল না যে শ্রীরাচন্দ্র অবতার। তারপর যখন সে চন্দ্রলোক, দেবলোক কৈলাশ ঘুরিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের হাত হইতে কিছুতেই নিস্তার পাইল না তখন শেষ নিজে আসিয়াই শ্রীরামচন্দ্রকে ধরা দিল ও তাঁহার শরণাগত হইল। শ্রীরামচন্দ্র তখন ভূষণ্ডী কাক্‌কে ধরিয়া মুখের ভিতর ফেলিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। ভূষণ্ডী শ্রীরামচন্দ্রের উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল,—সে তাহার সেই গাছের উপর নিজের বাসাতেই বসিয়া রহিয়াছে। কাক্ ভূষণ্ডীর অহঙ্কার চূর্ণ হইল—সে বুঝিল শ্রীরামচন্দ্র দেখিতে মানুষের মত বটে কিন্তু তাঁহার উদরে

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, জীব জন্তু সবই তাঁহার উদরে রহিয়াছে।

অহঙ্কারের জন্যই মানুষের বিশ্বাস কম। এই অহঙ্কারের জন্যেই ভগবানকে চিনিতে পারে না। যাহার অহঙ্কার নাই সেই ভগবানকে চিনিতে পারে। তাহাকে নিজে হইতে আসিয়া ভগবান দেখা দেন।

ভগবানের দান

একজনের ছেলের ভারি অসুখ। কিছুতেই আর সারে না ডাক্তার জবাব দিয়া গেছে। ছেলেটা যে ভাল হয়ে উঠবে তার কোন লক্ষণই নেই। সেই সময় একজন কবিরাজ এসে বল্লেন,—"স্বাতী নক্ষত্রে যদি বৃষ্টি হয়—আর সেই বৃষ্টির জল যদি মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে—সেই জলে যদি সাপে বিষ ঢেলে দিয়ে যায়—তাহ'লে সেই বিষের জলে যদি ঔষধ তৈরী করিয়া তোমার ছেলেকে খাওয়াইতে পারা যায়—তাহা হইলে তোমার ছেলে বাঁচিতে পারে।"

লোকটী ছেলেটীর জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দে'খবে স্থির করিল। দিন ও নক্ষত্র দেখিয়া সে ঔষধের সন্ধানে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে রাস্তায় চলিতে চলিতে আকুল হৃদয়ে কেবলই ভগবানকে বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর—আমার

ছেলেটীকে বাঁচাও—তুমি জোট-পাট করিয়া দিলেই হয়।”

সে ঠাকুরকে ডাকিতেছে আর পথ চলিতেছে—চলিতে চলিতে দেখিল রাস্তার এক পার্শ্বে একটী মড়ার খুলি পড়িয়া রহিয়াছে। মড়ার খুলি দেখিয়া লোকটার ভারি আনন্দ হইল—আকুল কণ্ঠে বলিল,—“ঠাকুর যখন মড়ার খুলি দেখাইয়া দিয়াছ, তখন এইবার একটু বৃষ্টি দাও।”

সত্য সত্যই একটু পরেই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে সেই বৃষ্টির জলে মড়ার খুলিটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই লোকটী গদ্‌গদ্ কণ্ঠে আবার বলিল,—“ঠাকুর মড়ার খুলিও দিয়াছ স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টিও দিলে—এইবার ইহাতে একটু সাপের বিষ দাও।”

লোকটী আকুল ভাবে এই কথা কেবলই ঠাকুরকে জানাইতেছে—সেই সময় সহসা চাহিয়া দেখিল একটা ব্যাংকে একটা সাপ তাড়া করিয়া আসিতেছে—ব্যাংকে ছোবল মারিবার জন্য সাপটা



"ঠাকুর, তোমার দয়া হইলে সকলই সম্ভব হয়—"

যেই ফণা তুলিল অমনি ব্যাংটা সেই মড়ার খুলিটা লাফাইয়া পালাইয়া গেল। সাপের সমস্ত বিষটা সেই মড়ার খুলির উপর পড়িল। এই ব্যাপার দেখিয়া সেই লোকটী আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। আনন্দে দুই হাত তুলিয়া নাচিতে নাচিতে কেবলই বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, ঠাকুর তোমার দয়া হইলে সকলই সম্ভব হয়।"

আকুলতায় সকলই সম্ভব হয়। আকুল হইয়া মানুষ যখন ভগবানকে ডাকিতে থাকে তখন সে ডাক ভগবানের কর্ণে পৌঁছিবেই পৌঁছিবে। আকুলতা না থাকিলে কোন কাজেই মানুষ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য

শ্রীরামচন্দ্র গুরুর কাছে বিদ্যালাভ করিতেছিলেন। অধ্যায়ণ শেষ করিয়া যখন তিনি সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হইলেন—তখন তিনি তাঁহার গুরুদেবকে বলিলেন,—"গুরুদেব আমি সংসার ত্যাগ করিতে চাহি।"

শ্রীরামচন্দ্র সংসার ত্যাগ করিবেন এ সংবাদ সমস্ত অযোধ্যাময় প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। এমন সোণার চাঁদ ছেলে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবে দুঃখ আর কাহার না হয়? দশরথ পুত্রকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না। তিনি সংসার ত্যাগ করিতে একেবারে স্থির প্রতিজ্ঞ। দশরথ অন্য উপায় না দেখিয়া শেষ বশিষ্টকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বশিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—দশরথ বশিষ্টকে

সমস্ত ব্যাপার বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বুঝাইতে বলিলেন। বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন শ্রীরামচন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্য আসিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—শুনিলাম তুমি গৃহ ত্যাগ করিতে স্থির করিয়াছ। কিন্তু আগে বিচারে আমাকে পরাস্ত কর, তবে গৃহ ত্যাগ করিবে। তোমাকে কেবল আমি একটী প্রশ্ন করিতেছি—সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া—তাহা যদি হয় তাহা হইলে তুমি অনায়াসেই সংসার ত্যাগ করিতে পারো।”

বশিষ্টের কথায় শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন—ঈশ্বর ছাড়া সংসারে আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জীব জগৎ সমস্তই হইয়া আছেন। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্টের প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না,—তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কাজে কাজেই তাঁহার সংসার ত্যাগ করাও আর হইল না।

ভগবান সমস্ত জীবে ও সমস্ত স্থানেই আছেন।

কাজেই তাঁহাকে পাইবার জন্য সংসার ত্যাগ করিবার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। নিবিড় বনে গেলেও ভগবান মিলে না—আবার সংসারেতেও ভগবান মিলে না। যাহার প্রাণে একান্ত ভক্তি, প্রগাঢ় ব্যাকুলতা আছে সেই কেবল ভগবান লাভ করিয়া থাকে।

দুই বন্ধু

দুই বন্ধু সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল ; রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা দেখিল এক জায়গায় ভাগবৎ পাঠ হইতেছে। দুই বন্ধুর ভিতর একজন বলিল,—"এস ভাই একটু ভাগবত শোনা যাক।"

অপর বন্ধু বলিল,—"ভাগবত শুনিয়া কি হইবে চল বরং একটু থিয়েটার দেখিয়া আসি।"

কিন্তু প্রথম বন্ধু তাহাতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না—সেইখানেই ভাগবত শুনিতে বসিয়া গেল। দ্বিতীয় বন্ধু একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া থিয়েটার দেখিতে চলিয়া গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ থিয়েটার দেখিবার পর—তাহার কেমন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার থিয়েটার দেখিতে একেবারেই ভাল লাগিতেছিল না—সে মহা বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল,—"ধিক আমাকে—বন্ধু আমার ভাগবত শুনিতেছে—আর আমি কিনা থিয়েটার দেখিতে

আসিলাম! আমার বোধ হয় চিরজীবন নরকে থাকিতে হইবে।"

এদিকে যে ব্যক্তি ভাগবত শুনিতেছিল,—তাহারও ভাগবত শুনিতে শুনিতে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল—সেও মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"আমি কি বোকা! বন্ধু কেমন থিয়েটার শুনিয়া আমোদ করিতেছে—আর আমি কিনা ইহারা কি ব্যাড় ব্যাড় করিয়া বকিতেছে—তাহাই বসিয়া বসিয়া এখানে শুনিতেছি।"

তাহার পর দুই বন্ধুর যখন মৃত্যু হইল—তখন যে ভাগবত শুনিতেছিল তাহাকে যমদূত আসিয়া লইয়া গেল আর যে থিয়েটার শুনিতে গিয়াছিল তাহাকে বিষ্ণুদূত আসিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল।

ভগবানের নিকট কিছু ঢাকা থাকে না। তিনি মানুষের উপরটুকু দেখেন না—তিনি মানুষের ভিতর দেখিয়া থাকেন।



জড়োয়া।

প্রীতিবালার ভাবনার অন্ত নেই। হঠাৎ মেয়েটির বিবাহ স্থির। স্বামী বিদেশ হইতে যে দিন পৌঁছিবেন, তার পরদিনই সুমতির বিবাহ। তিনি টাকা কড়ি পাঠাইয়াছেন, প্রীতি যেন দেবরটিকে সঙ্গে লইয়া জড়োয়া গহনা-টহনা পছন্দ করে কিনে ফেলেন। তিনি ত বলিয়া খালাস, প্রীতির যে সাহস হয় না। দেবরটি ছেলেমানুষ, আর তিনি স্ত্রীলোক। প্রীতি জানালার ধারে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন।

দেবর সুবিনয় ঘরে ঢুকিয়া দলিল—হয়েছে বৌদি, হয়েছে। সব দেখে শুনে এসেছি, গাড়ীও ডেকে এসেছি, চল। ঠাকুরলাল হীরালালের দোকানে সব পাবে। আর কি বলব বৌদি—কি সুন্দর কাজ! কত বড় বড় লোকের মেয়েরা যে এসে সব কিনে নিয়ে যাচ্ছেন—কি বলব! প্রথম প্রথম যখন কিছু জানতাম না, তখন হীরে মুক্ত কিনতে গিয়ে কত যে ঠকেছি--কিন্তু এদের কাছে কেউ একটী পয়সাও ঠকে না—তাই না তাদের দোকানের এত নাম। তাই ত তাদের দোকান এত বড় হয়েছে।

প্রীতির একটা মস্ত দুর্ভাবনা কাটীয়া গেল। তিনি তখনি ১২ নং লালবাজার ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কিনিয়া ফেলিলেন।

প্রীতির স্বামী আসিয়া বলিলেন—আমি ত ভেবেই সারা। তোমরা কতদূর কি করলে! দেখে ভারী খুসী হ'য়েছি। কিন্তু—বলিয়া সকলের অসাক্ষাতে প্রীতির গণ্ডে খুসীর চিহ্ন পরিয়ে দিলেন।

একদিনে

(একমিনিটের গল্প)

খোভা কাউকে কিছু বল্‌বে না, নিজের মনে কেঁদেই সারা! তার যে প্রাণের বন্ধু মেনির বিয়ে, চিঠি খানা পেতে তার দেরী হ'য়ে গেছে, আজই বিয়ে। সে যে তাকে একছড়া হার দেবে বলেছিল, সে আর হল না—কেঁদেই সারা।

তার ভাই হিরণ অনেক ডাকাডাকি সাধ্যি সাধনা করার পর দোর খুলে, কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেল্লে।

শুনে হিরণ ত হেসেই বাঁচে না! পোড়ার মুখীর এরই জন্যে এত কান্না! তা বলিস্‌নি কেন রাক্ষুসী! চ—আমার সঙ্গে, কি অর্ডার দিবি—চ।"

পোড়ার মুখী ছল ছল চোখে বল্লে—আজই যে দাদা!

আজই—আজই! তুই চ। বি, বিশ্বাসের দোকানে, এখন অর্ডার দিয়ে আসি, বিকেল পাঁচটার ভেতর পাওয়া যাবে। যা কাপড় ছেড়ে আয়, মুখটা ভালো করে ধুয়ে ফেল,—কেঁদে কেঁদে ফুলে উঠেছে।

এটা গল্প নয়—সত্যি কথা! ছেলে মেয়েরা, তাদের মা-মাসীরা ১৭২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে বি, বিশ্বাসের দোকানে গিয়ে বা চিঠিতে অর্ডার দিয়ে পরখ করতে পারেন।

দেশী সাবান

(গল্প)

দুই সঙ্গীতে অনেক দিনের পরে দেখা। কমলিনী বল্লে—আর বলো না ভাই, মরে গেলুম। কি যে হাওয়া এসেছে, ছেলেগুলো খোস পাঁচড়ায় সারা হ'য়ে গেল। এত তেল ওষুধ লাগানো হচ্ছে কিছুতেই কিছু হচ্ছে না ভাই।

মৃণ্ময়ী বল্লে, খোস পাঁচড়ার কি ওষুধ আছে বোন। ও শুধু ধোয়া। ভাল করে ধো, সেরে যাবে।

তা ত ধোব কিন্তু যত ভাই বাজে দেশী সাবান উঠেছে, কোনটাতেই কিছুই হচ্ছে না। উনি আবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিদেশী জিনিষ—ওষুধ অবধি কিনবেন না।

তার ত দরকার নেই কমল। চালমুগরা, নিম, কার্ব্বলিক, এ সব ত দিশী হ'য়েছে, আমি নিজে ব্যবহার করেছি।

কোথায় মৃণ্ময়ী ?

ওমা তোরা ভাই কিছু জানিস্ নে বুঝি ? অবাক কর্‌লি যে! বালিগঞ্জে মস্ত কারখানা হয়েছে, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্ তার নাম। আমরা ত গায়ে মাথার বাথ, লেবেণ্ডার, বকুল হোয়াইট রোজ, চন্দন—সব ওদেরই ব্যবহার করি। দেখলে তুই অবাক হবি। শুধু তাই! আমি ত ধোপার জ্বালায় জ্বালাতন হ'য়ে ওদের বাঙ্গালী-পল্টন দিয়েই কাপড় চোপড় কাচিয়ে নিচ্ছি।

সত্যি ?

সত্যি নয় ত কি মিথ্যে ? দেখ না একবার পরখ করে। পশমী কাপড় কাচবার সাবানও চমৎকার—নির্ম্মলিন।

তুই ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যা ভাই।

ঠিকানা আর কি ? সব জায়গায় পাওয়া যায়। আফিস্ হল ১৭ নং এজরা ষ্ট্রীট।

খদ্দরের পোযাক।

(গল্প)

ভাই বোনেরা ভাবছে, নিতুর কাপড় নেই, জামা নেই, সে বুঝি নেমতন্ন যাবে না। নিতুর মা'ও তাই জানেন! নিতু ঘরে দোর দিয়ে আছে। কেউ তাকে ডাক্‌ছে না—সবাই ত জানে নিতু কেমন একবগ্‌গা ছেলে, খদ্দর ছাড়া কিছু সে পরে না,—আজ আবার মস্ত এক বড় লোক আত্মীয়ের বাড়ী নেমতন্ন—সেখানে কি আর খদ্দর পরে যাওয়া চলে।

গাড়ী এসেছে, ভাই বোনেরা কোলাহল করিতে করিতে যাচ্ছে, নিতু খুট্‌ করে দোর খুলে সামনে এসে দাঁড়াল। নিতুর কাপড়, জামা, চাদর একেবারে ঝক্‌ মক্‌ করছে।

এ সব কোথা পেলিরে নিতু? এ কিসের তৈরী রে?

খদ্দরের, মা! বাবা কমলালয় থেকে কিনে দিয়েছেন। এই যে কাজ দেখছ এ ত দেশী সুতোর তৈরী। চল—মা!

মার মুখে হাসি ফুটে উঠল!

নিতুর দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—কমলালয় কোথা রে নিতু!

ঐ যে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের নীচে, দাদা!

কাল আমাকে নিয়ে যাবি?

যাব।

ছেলেমেয়েদের আশা ও তৃপ্তি-

শিশুভোষ সিরিজ

সম্পাদক—শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ

আশ্বিন ১৩২৭ হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক বহিতে অনেকগুলি করিয়া একরঙা ছবি আছে। মোটা এন্টিকে, রঙ বেরঙের কালিতে ছাপা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲ প্রতি সংখ্যা ।৵০

১ম বর্ষ

১। পৃথিবীর জন্ম
২। প্রকৃতির পরাভব
৩। কানুর কীর্ত্তি
৪। আর্য্য ও অনার্য্য
৫। আজগুবি জন্মকথা
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ
৭। গল্পে রামকৃষ্ণ
৮। সত্যযুগের কথা
৯। উদোল বুড়োর সাঁওতালী গল্প
০। রামকৃষ্ণের আরো গল্প
১১। সতী
১২। উদোল বুড়োর আরো গল্প

২য় বর্ষ

১৩। বাপ্পাবীর
১৪। পৌরাণিক জন্মকথা
১৫। হাজী মহম্মদ মহসীন
১৬। কর্ম্মদেবী
১৭। মজার গল্প
১৮। ভীষ্ম
১৯। রামকৃষ্ণের নূতন গল্প
২০। জাতকের গল্প
২১। রামকৃষ্ণের দেদার গল্প
২২। ঠাকুরদের গল্প
২৩। হামির

ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী কয়েকখানি বই

ডিরেক্টর কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মিত্র, বি, এস-সি,

(গ্লাসগো) এম, আর, স্যান, আই (লণ্ডন) প্রণীত

১। বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে

চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের কথা ছেলেমেয়েদের বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের মূল্য ১৲

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, প্রণীত

২। ফাঁখের ভোগ

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, প্রণীত

৩। বৈশাখী

প্রত্যেকখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি—সম্মোহিনী ভাষায় ভূত পরীর গল্প —প্রত্যেকখানিতে ৫০ খানির উপর ছবি আছে।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি, এ,

৪। রোমের গল্প

রোমের চিরনূতন ঐতিহাসিক গল্প—মূল্য ।৵০

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার

৫। আমার বলো

শিশুদের রূপকথা। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ॥৵০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস

৬। হিতোপদেশ।

পত্তে পয়ার ছন্দে লেখা। উপহারের পক্ষে এ বইর তুলনা নাই আগাগোড়া আর্ট পেপারে ছাপা। মূল্য ৸৵০

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

৭।

সত্যগ্রাহী কে? যিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। সত্যের অনুরোধে শত যন্ত্রণা, শত অত্যাচারও সহ্য করেন—কিন্তু নিগ্রহকারীর প্রতি কোনরূপ শত্রুভাব পোষণ করেন না—তিনিই। প্রহ্লাদ, ডেনিয়েল সক্রেটিস্‌, মীরাবাই, যীশু, গান্ধী সত্যগ্রাহী। তাহাদের জীবন কাহিনী—তাঁহাদের ত্যাগের মাহাত্ম্য ছেলেমেয়েদের সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ॥৵০।

ছেলেমেয়েদের কয়েকখানি যুগান্তকারী বই ছাপা হইতেছে---

'চিত্রে ও গল্পে' সিরিজের—

১। স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে

২। শিল্প-কলা চিত্রে ও গল্পে

৩। দেশ-বিদেশ চিত্রে ও গল্পে

৪ শুশ্রূষা চিত্রে ও গল্পে

৫। ছেলেদের গান্ধী

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত

৬। সরল বাঙ্গলা সাহিত্য

ছেলেমেয়েদের অবশ্য শিক্ষণীয় এই সব বিষয়গুলি চিত্র ও গল্পের মধ্য দিয়া বলা হইয়াছে। এই বইগুলির জন্য আপনি এখনই অর্ডার দিন।

শিশুদের জন্য—

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

১। হাসির ছড়া

২। মজার ছড়া

শিশুদের হাতে দিন, পড়িতে পড়িতে হাসিয়া তাহারা লুটো-পুটি খাইবে। যেমন সুন্দর হাসির ছড়া—তেমনই সুন্দর হাসির ছবি—অথচ উপদেশ পূর্ণ। মূল্য প্রত্যেকখানি ।০ আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস্, সি, সম্পাদিত

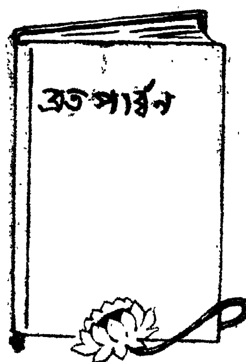
পার্ব্বণী

(১৩২৭)

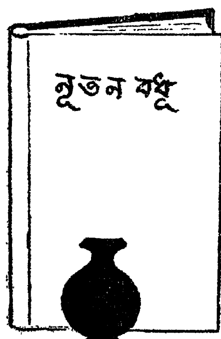
পার্ব্বণী একখানি বার্ষিক পত্র। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মিলিত চেষ্টায়, এবং নগেন্দ্রবাবুর প্রাণপাত পরিশ্রমে এই পুস্তকখানি বাহির হইয়াছে। দুখানি তিনরঙা ছবি আছে,—

লিখিয়াছেন :—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (গল্প)
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী
শ্রীমতী সীতাদেবী
শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বরলিপি)



হিন্দু নারীর ব্রত, পার্ব্বণ সংযম শিক্ষা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতকেও স্তম্ভিত করিয়াছে, হিন্দুর নিকট এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের শুধু এইটুকু বক্তব্য আছে যে এ বাজার সংস্করণ ব্রতকথা নহে। ইহার প্রত্যেকটি ব্রত প্রাণ মন দিয়া লেখা। প্রত্যেকটি ব্রতের গল্পাংশ মুখে শোনার মত মিষ্টি। তাহার পর তিন রঙা ৪।৫ খানি ছবি, ও এক রঙা অসংখ্য ছবি। গোলাপি এণ্টিকে ছাপা, প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।



আমাদের দেশে বালিকাদের পাঠোপযোগী উপন্যাস বড় একটা দেখা যায় না। **নূতন** বধূ পড়িলে আমোদের সঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের কচি কচি মনগুলি সুগঠিত হইয়া উঠিবে। ইহাতে বন্ধুত্বের জন্য স্বার্থত্যাগের চিত্র আছে; স্নেহের, প্রেমের সরস মধুর আখ্যান আছে। ইহাতে পুরুষ চরিত্র আদৌ নাই। কিশোরী চরিত্র লইয়াই গল্পটি লেখা। গোলাপি এন্টিকে ছাপা। তিন রঙা ও এক রঙা ছবি আছে। প্যাডে বাঁধাই। মূল্য ১৷০ মাত্র।